বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি
Socio-Economic and Political Background of the Emergence of Bangladesh

ইউনিট ৫

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি যে বিজয় অর্জন করে তার প্রেক্ষাপট রচিত হয় মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই। প্রায় দুইশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় যেখানে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দেশ বিভাগের পর পরই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী প্রথম আক্রমণ করে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার উপর। বাংলার বদলে উর্দুকে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠী বেশ তৎপর হয়ে উঠে। কিন্তু সাহসী বাঙালিদের ক্রমাগত প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রতিফলন ঘটে যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ঘোষিত আন্দোলনের মাধ্যমে। নিরীহ আন্দোলনকারীদের জীবনের বিনিময়ে একপর্যায়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। মূলত ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও বেশি শক্ত অবস্থানের উপর দাঁড়ায়। এরপর ১৯৫৪ এর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফন্টের বিজয়, ১৯৬৬ এর ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সব মিলিয়ে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ নিপীড়ন, নির্যাতন ও অবজ্ঞার বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙালি জাতি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ায়। এর প্রতিফলন ঘটে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। অবশেষে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ এবং নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৫.১: ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ
পাঠ- ৫.২: বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
পাঠ- ৫.৩: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য
পাঠ- ৫.৪: বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একুশ দফা ও ছয় দফার গুরুত্ব
পাঠ- ৫.৫: ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন
পাঠ- ৫.৬: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু

পাঠ-৫.১ ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ
Language Movement and Development of Bengali Nationalism

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভাষা আন্দোলন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রভাষা।

ভাষা আন্দোলন

ভারতবর্ষের জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবসান এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম বাঙালির ভাষার উপর তীব্র আঘাত হানে। মূলত ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম আঘাতটা আসে ভাষার উপর। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকার একটি সমাবেশে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। অবশ্য তার পূর্বে ১৯৪৭ সালে করাচীর একটি জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ অনেক বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৪৭ সালের ৮ ই ডিসেম্বর বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। তমদ্দুন মজলিশের অধ্যাপক নূরুল হক ভূইয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য একটি প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু গণপরিষদের অবাঙালি পাকিস্তানি সদস্যরা এর সমালোচনা করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য শামসুল আলমের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ধর্মঘটের দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, আব্দুল ওয়াহেদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক নাগরিক সমাবেশে ঘোষণা দেন যে, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ২৪ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত আরেকটি সমাবেশেও তিনি একই ঘোষণা দেন। কিন্তু উপস্থিত ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম হওয়ার পর আওয়ামী লীগ তাদের মেনিফেস্টোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টিকে গুরুত্বের সংঙ্গে তুলে ধরে। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিন এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় আসেন। তিনিও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য দেন। তার বক্তব্যে জের ধরে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এক সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা এবং বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে ছাত্রদের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সংকল্পে অঁটুট থাকে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' চাই শ্লোগানে ছাত্র-শিক্ষক, পেশাজীবী, সাধারণ মানুষ মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। পুলিশ মিছিলে অতর্কিত লাঠিচার্জ শুরু করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সেদিন

রফিক (রফিক উদ্দিন আহমদ), জব্বার (আবদুল জব্বার), বরকত (আবুল বরকত), সালাম (আবুদস সালাম) ও অহিউল্লাহ নামের এক শিশু নিহত হয়। ভাষা আন্দোলনের এ তীব্রতায় সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে নমনীয় হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ মে গণপরিষদে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ অবদান রেখেছে তার মধ্যে- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

(১) **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন:** বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ভাগের পর পাকিস্তান অংশের সাথে বাংলাকে যুক্ত করা হয়। তার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে এদেশের নাম রাখ হয় পূর্ব পাকিস্তান। সমস্ত পাকিস্তানের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের (শতকরা ৫৬ ভাগ) ভাষা ছিলো বাংলা। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নীল নকশার ষড়যন্ত্র শুরু করে। আর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সময় উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। তবে এদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী তাদের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। অবশেষে ১৯৫২ সালের এদেশের ছাত্র-শিক্ষক এবং জনতার সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের দাবী মানতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভাষা আন্দোলনের এ ঘটনার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়।

(২) **১৯৫৪ সালের নির্বাচন:** ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের হীন ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে শোষণ শুরু করে। কিন্তু এদেশের বাঙালি নেতৃবৃন্দ তাদের শোষণের ছক বুঝতে পেরে রাজনৈতিকভাবে আরও সচেতন ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। অতপর ১৯৩৫ সালের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এবং খিলাফতে রব্বানি পার্টির সমন্বয় গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ আসনের মধ্যে ২২৮ টি আসন লাভ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলে বোঝা যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা কতটা সুদৃঢ় ছিল।

(৩) **১৯৬৬ সালের ৬ দফা:** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং এদেশের মানুষকে সমস্ত প্রকার বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি পাকিস্তানী শোষণের প্রকৃত মাত্রা বুঝতে পারে এবং নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠে। ৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সকল রসদ বিদ্যমান ছিল। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে এর বাস্তবে প্রতিফলন ঘটেছিল।

(৪) **১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান:** বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষ গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদে রূপ নেয়। ঢাকার রাজপথ রূপান্তরিত হয় মিছিলের নগরীতে। গভর্নর হাউস ঘেরাও হলে পুলিশের সাথে জনতার ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই সূত্র ধরে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এসময় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। গণঅভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে আরও একটি অনন্য ঘটনা।

(৫) ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনঃ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে। দীর্ঘদিনের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ আরও বেশি সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তখন অসহায় মানুষের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার বিষয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। যার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও সুদৃঢ় হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তা প্রমাণিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসনে এবং জাতীয় পরিষদের (পূর্ব পাকিস্তান) ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে গঠিত ঐক্য ও সংহতি কতটা সুদৃঢ় হয়।

(৬) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণঃ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি কেবল মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত এবং অনুপাণিত করেননি, এ জনপদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করেছেন। গুরুত্ব এবং প্রভাব বিবেচনা করে ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চেও ভাষণকে "বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল" বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(৭) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধঃ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ঘটনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সমগ্র বাঙালি জাতি নিঃসঙ্কচিত্তে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ দিনের শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের ফলে পুঞ্জিভুত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে অগ্নিঝরা মুক্তিসংগ্রামে মধ্য দিয়ে। ২৩ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তির এ মঞ্চ প্রস্তুত করেন বাঙালির অবিসাংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বানে অকুতোভয় সাধারণ মানুষ জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং প্রায় দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। বস্তুত বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে মুক্তিযুদ্ধই সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে প্রভাবশালী উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে যে সবচেয়ে প্রথম প্রভাব ফেলে সেটি হলো ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, আন্দোলন-সংগ্রাম ইত্যাদি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, ১৯৬৬ সালের বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৬২ সালে

(গ) ১৯৫১ সালে (ঘ) ১৮৫২ সালে।

২। যুক্তফ্রন্ট কয়টি দল নিয়ে গঠিত হয়-

(ক) ৩ টি (খ) ৪ টি

(গ) ৫ টি (ঘ) ৬ টি।

পাঠ-৫.২ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
Role of Bangabandhu in the Development of Bengali Nationalism

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ছয়দফা, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা পায় যে মহান মানুষটির হাত ধরে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি না থাকলে বাংলাদেশ হতো না যেমন সত্য, তেমনই বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা পেত না এটাও সত্য।

বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদঃ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের যে কয়টি ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিবুর রহমান তখন তরুণ নেতা। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সারা বাংলাদেশে জনসংযোগ করেন। তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। ফলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। তিনি বাংলার মানুষকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ফলে জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের অমায়িক আচরণ, প্রবাদতুল্য স্মৃতিশক্তি এবং সম্মোহনী বক্তব্য মানুষকে আকর্ষণ করতো। আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণ বঙ্গবন্ধুকে চরমভাবে নাড়া দেয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে ৬ দফা দাবি উত্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বঙ্গবন্ধুর এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু উক্ত সম্মেলন বর্জন করেন। ছয়দফার মূল বক্তব্য তিনি গণমাধ্যমে প্রকাশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা কর্মসূচি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই কর্মসূচি ঘোষণার ফলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে এবং ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো প্রবল হয়ে উঠে। ১৯৬৯ সালে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ঘোষণা করেন, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট হিসেবে অংশ নিবেন না। বঙ্গবন্ধু এবং অন্য ৩৪ আসামিকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল সমাবেশ থেকে তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। সবার আস্থা ও ঐক্যের প্রতীক।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে। দুর্যোগে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তখন অসহায় মানুষের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের প্রতি

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয় লাভ করে এবং জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে। মূলত বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কারণে এদেশের জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভরাডুবি নিশ্চিত করে।

নির্বাচনে জয়লাভ করলেও বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণই মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুক্তির সনদ যা প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডাক। এ ভাষণের গুরুত্ব ও প্রভাব বিবেচনা করে ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে "বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল" বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐদিনের ভাষণে বাঙালি জাতি উপলব্ধি করেছিল, যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে।

২৫ মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়চিত্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষ দেশের জন্য পরিবার পরিজন ছেড়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণপণ যুদ্ধ করে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে, বঙ্গবন্ধু নামে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এটিই জাতীয়বাদ বিকাশের সর্বোচ্চ শিখর। এখানে বঙ্গবন্ধুই মূল চরিত্র।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিরূপণ করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃশ্যমান ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে চেনার সুযোগ করে দেয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। এ বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুক্তির সনদ। মূলত এটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ঘোষণাপত্র। ঐদিনের ভাষণে বাঙালি জাতি উপলব্ধি করেছিল যে, যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন পায় –

(ক) ২৬৬ টি (খ) ২৬৮ টি

(গ) ২৮৮ টি (ঘ) ২৯৮ টি

২। সম্প্রতি ইউনেস্কোর "বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল" হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে কোন ভাষণ-

(ক) বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ (খ) বঙ্গবন্ধুর ২৫ মার্চের ভাষণ

(গ) বঙ্গবন্ধুর ১৪ ফেব্রুয়ারির ভাষণ (ঘ) বঙ্গবন্ধুর ১৯ মার্চের ভাষণ।

পাঠ-৫.৩ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য
Socio-Economic Discrimination Between East and West Pakistan

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, বৈষম্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, চাকরি।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্ব যেমন অনেক বেশি ছিল, তেমনি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও ছিল ব্যাপক বৈষম্য। বৈষম্যের শুরু হয় মাতৃভাষার উপর আঘাতের মধ্য দিয়ে। যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা, সেখানে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নীলনকশা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(০১) **সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য:** সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের চারটি ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত ছিল বাংলা ভাষা যা সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা। কিন্তু ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্যের অন্যতম উদাহরণ। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের প্রতিও পশ্চিম পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব খুব ইতিবাচক ছিল না। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অপমান, অসম্মান ও বৈষম্যের স্বীকার হতো।

(০২) **শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য:** শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান চরম বৈষম্যের স্বীকার হয়। একটি বাজেটে শিক্ষা খাতে করাচীর জন্য ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার, সিন্ধুর জন্য ১০ লক্ষ, সীমান্ত প্রদেশে ১১ লক্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৭১ হাজার টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিদেশে পড়ালেখা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকদের যে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের তা দেওয়া হতো না।

(০৩) **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** পাকিস্তানের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো কেন্দ্রীয় সরকার। আর কেন্দ্রীয় সরকার ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। পাট, চা, চমড়াজাত দ্রব্য সবকিছু রপ্তানি হতো করাচি বন্দর থেকে। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বৈষম্য বিরাজমান ছিল। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ৬১.৪ শতাংশ রপ্তানী আয়ের বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানী আয় ছিল ৩৮.৬ শতাংশ। কিন্তু মোট জাতীয় বাজেটের ৭৫ শতাংশ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো মাত্র ২৫ শতাংশ[১]। সড়ক, রেল যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে পশ্চিম পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। এমনকি বহিবিশ্বের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগকেও গুরুত্ব দেয়া হতো না।

(০৪) **রাজনৈতিক বৈষম্য:** পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সবসময় উদাসীন ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করে সরকার গঠন করলেও কিছুদিনের মধ্যে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এদেশের মানুষের অধিকারের কথা বলার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বার বার জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়। ছয়দফা ঘোষণার পর ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হয়রানি করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা নানা

[১]. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঢাকা, প্রতীতি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২।

টালবাহানা শুরু করে। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে এবং নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে।

(০৫) **চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য:** সামরিক বাহিনীর (বিমান, নৌ ও সেনা) সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, মহাপরিচালকের কার্যালয় সবকিছু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রায় ৫৬ শতাংশ ব্যয় হতো সামরিক খাতে, যার মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে। নিয়োগের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের ৮৯৪ জন সেনাকর্মকর্তার বিপরীতে বাঙালি সেনাকর্মকতা ছিলেন মাত্র ১৪ জন। নৌ এবং বিমান বাহিনীতে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৫৯৩ এবং ৬৪০ জনের বিপরীতে ০৭ জন এবং ৬০ জন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে মোট ৫১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন ১৮৬ জন। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা এবং কর প্রদানের পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে এটি প্রমাণিত যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষের সাথে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বত্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ শোষণ, বঞ্চনার ও বৈসম্যের শিকার হয়েছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্ব যেমন অনেকটা বেশি ছিল তেমনি আর্থ-সামাজিক দিকেও ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের চারটি ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষীদেরকে টার্গেট করে তাদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়।। পাকিস্তানের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো কেন্দ্রীয় সরকার। আর কেন্দ্রীয় সরকার ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সবসময় উদাসীন ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পাকিস্তানের সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর দপ্তর কোথায় ছিল –

(ক) পূর্ব পাকিস্তানে (খ) পশ্চিম পাকিস্তানে

(গ) ভারতে (ঘ) আফগানিস্তানে

২। বাংলা ভাষায় পাকিস্তানের কত শতাংশ মানুষ কথা বলতো?

(ক) ৬৬ শতাংশ (খ) ২৫ শতংশ

(গ) ৫৬ শতাংশ (ঘ) ৫২ শতাংশ

৩। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় বাজেটের ব্যয়ের হার কেমন ছিল?

(ক) ৫০ : ৫০ শতাংশ (খ) ৪০ : ৬০ শতাংশ

(গ) ৬০ : ৪০ শতাংশ (ঘ) ৭৫ : ২৫ শতাংশ

পাঠ-৫.৪ বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একুশ দফা ও ছয় দফার গুরুত্ব
Emergence of Bangladesh: Importance of 21 Points and 6 Points

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একুশ দফার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছয় দফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, একুশ দফা, ছয় দফা।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে একুশ দফা এবং ছয় দফা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিপরীতে এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকারের দাবি তোলা হয়েছিল। একুশ দফা ও ছয় দফা মূলত রাজনৈতিক কর্মসূচি। কিন্তু এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিকে ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। চূড়ান্ত বিচারে এগুলো এদেশের রাজনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে একুশ দফা এবং ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

একুশ দফা

একুশ দফা ছিল মূলত ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার। এ ইশতেহার নির্বাচনে জয়লাভে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, তেমনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়েও এর ভূমিকা রয়েছে। মূলত দফাগুলোর মধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ রোপিত হয়েছিল। দফাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

(১) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী;
(২) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সকল খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার দাবী। খাজনার পরিমাণ হ্রাস এবং সার্টিফিকেট জারির মাধ্যমে খাজনা আদায় প্রথা রহিত করার ব্যবস্থা;
(৩) পাটব্যবসা জাতীয়করণ করে তা পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হবে এবং মুসলিম লীগ শাসনামলের পাট-কেলেঙ্কারি তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা;
(৪) কৃষিক্ষেত্রে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং সরকারি অর্থ সাহায্যে কুটিরশিল্পের উন্নয়ন সাধন করা;
(৫) পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে এবং লবণ-কেলেঙ্কারির তদন্তও অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা;
(৬) কারিগর শ্রেণির গরিব মোহাজেরদের কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) খাল খনন ও সেচব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া;
(৮) পূর্ববঙ্গে কৃষি ও শিল্প খাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মূলনীতি মাফিক শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা;
(৯) দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা;
(১০) শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যকার বৈষম্য বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে;
(১১) ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল করে সবার জন্য উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করা;
(১২) শাসন পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা; যুক্তফ্রন্টর কোনো মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত;
(১৩) দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশ্ওয়াত বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(১৪) জননিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ কালাকানুন বাতিল, বিনাবিচারে আটক বন্দির মুক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্তদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করার অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা;
(১৫) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা;

(১৬) বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা;

(১৭) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া;

(১৮) একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা;

(১৯) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববাংলা সরকারের অধীনে আনয়ন; দেশরক্ষাক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর হেডকোয়র্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন; এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা;

(২০) কোন অজুহাতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইন পরিষদে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগপূর্বক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;

(২১) যুক্তফ্রন্টের আমলে সৃষ্ট শূণ্য আসনে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফন্ট-প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করা।

মূলত যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রাথমিক বীজ রোপন করে। এরপরে এর পূর্নাঙ্গ রূপ পায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার কর্মসূচির মাধ্যমে।

ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনে ৬ দফা দাবি উত্থাপনের চেষ্টা করেন। সম্মেলনে উত্থাপনে ব্যর্থ হয়ে তিনি ছয়দফার মূল বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে তিনি 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা কর্মসূচি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ছয় দফা কর্মসূচি মূলত বাঙালি জাদীয়তাবাদী আন্দোলনের এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী কর্মসূচি। নিম্নে দফাগুলো তুলে ধরা হলো:

(১) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;

(২) ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

(৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

(৪) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করার ব্যবস্থা;

(৫) দুই অংশের মধ্যে দেশিয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যেকোন বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সংবিধানে তার বিধান রাখা;

(৬) প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা।

উপরের আলোচিত একুশ দফা এবং ছয় দফা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। একুশ দফার মাধ্যমে আন্দোলনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় ছয় দফার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তা সফল হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ছয় দফার দফাগুলো লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একুশ দফা এবং ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। একুশ দফা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে যা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করে। বস্তুত যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রাথমিক বীজ রোপন করে। এরপরে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার কর্মসূচির মাধ্যমে। ছয় দফা কর্মসূচি মূলত বাঙালি জাদীয়তাবাদী আন্দোলনের এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী কর্মসূচি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। একুশ দফা কবে ঘোষিত হয়েছিল?

(ক) ১৯৪৮ সালে (খ) ১৯৫১ সালে

(গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৬৬ সালে

২। ছয় দফা অনুযায়ী ফেডারেল সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়–

(i) প্রতিরক্ষা

(ii) বাণিজ্য

(iii) বৈদেশিক সম্পর্ক

(iv) স্বরাষ্ট্র

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iv

৩। 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকাটি কবে প্রকাশিত হয়?

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ (খ) ০১ মার্চ ১৯৬৬

(গ) ১৮ মার্চ, ১৯৬৬ সাল (ঘ) ২৬ মার্চ ১৯৬৬

পাঠ-৫.৫ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন
Mass Uprising of 1969 and General Election of 1970

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবেন;
- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচি বলতে ও লিখতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ১১ দফা কর্মসূচি, সত্তরের নির্বাচন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত যেসব কর্মসূচির সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল তার মধ্যে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। বস্তুত এ দু'টি ঘটনাই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। স্বাধীনতার যৌক্তিক ভিত্তি, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচনের ভূমিকা সবথেকে বেশি। এখানে পর্যায়ক্রমে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ করেছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর দাবিগুলোকে রাষ্ট্রবিরোধী বলে প্রচারণা চালায়। ছয় দফা ছিল মূলত বাঙালির মুক্তির সনদ, স্বায়ত্তশাসনের দলিল। এ কর্মসূচি ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুর উপর পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করার অভিযোগ এনে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার শুরু হয়। কিন্তু জনগণের প্রবল দাবির মুখে ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও জেলগেট থেকে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। একের পর এক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হতে থাকে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনে সাড়া দেয়। আন্দোলন গণআন্দোলন রূপান্তরিত হয়। বিরোধী সব রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠন আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা এবং পরিচালনা করতে থাকে।

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচিকেও তাদের কর্মসুচির অন্তর্ভুক্ত করে। এগারো দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১। (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই.এ, আই.এস-সি, আই.কম ও বি.এ, বিএস-সি, বি.কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম.এ ও এম.কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং ও কেন্টিন খরচের ৫০ শতাংশ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষের ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্সড কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই.ই.আর ছাত্রদের দশ-দফা; সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম.বি.এ ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্সড কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও 'কন্সেসন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধাসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে:

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয় অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যেআমদানি-রপ্তানি চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব- ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

এসব দাবি আদায়ে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্দোলন ক্রমশ বেগবান হতে থাকে। আন্দোলন প্রতিহত করতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নামে। পুলিশের গুলিতে নিহন হয় কিশোর মতিউর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান। এতে আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়। আন্দোলন দমাতে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে। কিন্তু আন্দোলন ততদিনে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েও আন্দোলন দমন করতে পারছিল না। সরকার বিরোধী আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু সে সময় ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। দুর্বার আন্দোলনের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। তারা ঢাকায় প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা চালায়,

অগ্নিসংযোগ করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা মামলার আসামিদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সভা থেকেই শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে দেশ পরিচালান আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, দফা ও এগারো দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনঃ

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়যুক্ত করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে এবং জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে। এ বিজয়ের মূলে ছিল বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি। নির্বাচনে জয়লাভের পরও বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। একাধিকবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বস্তুত তাঁর ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়। শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায্যতার প্রতিবাদে আপামর বাঙালির সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে পাকবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে (২৬ মার্চ) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সত্তরের নির্বাচনের ম্যান্ডেট এবং পাকবাহিনীর নৃশংসতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের একটি ঘটনাপঞ্জি প্রস্তুত করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এ দু'টি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ এর নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কত দফা দাবি ছিল?

(ক) ১০ দফা (খ) ১১ দফা

(গ) ৬ দফা (ঘ) ২১ দফা

২। শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয় কবে?

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬

(গ) ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পাঠ-৫.৬ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু
Independence of Bangladesh and Bangabandhu

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বঙ্গবন্ধু, ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, বাংলাদেশ।

১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশে ঘোষণা করেন যে, উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। শুরু হলো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। ১৯৪৯ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ দুই ভাগ হয়ে উদারপন্থী নেতাদের নিয়ে 'আওয়ামী মুসলীম লীগ' নামের একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কে ফাটল ধরে। বস্তুত ভাষার জন্য রক্তদানের মাধ্যমে শুরু হয় দেশের জন্য আত্মবলিদানের প্রস্তুতি। সূচনা হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন ধারা। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়। এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। এ সংগ্রামের শুরুতে তরুণ শেখ মুজিব এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের যে কয়টি ঘটনা আছে তার মধ্যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তরুণ নেতা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়ান। শেখ মুজিব বাংলার মানুষকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতন করেন। তাঁর বাগ্মিতা, নেতৃত্ব, জনসম্পৃক্ততা এবং সাংগাঠনিক দক্ষতা নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ আসনের মধ্যে ২২৮ টি আসন লাভ করে। কেবল নির্বাচনে জয়লাভ নয়, তরুণ শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হতে থাকে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনকালে তাঁকে প্রায় ১২ বছর কাটাতে হয়েছে কারাবন্দি হিসেবে। এদেশের মানুষকে বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর ১৯৬৬ সালে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি নিজেদের প্রকৃত অবস্থান বুঝতে পারে এবং নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে আরও সোচ্চার হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সমস্ত রসদ ছিল। ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়তে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি থানা, মহকুমা (বর্তমান জেলা), বৃহত্তর জেলা, বিভাগ সফর করেন। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবী সর্বস্তরের মানুষকে তিনি ছয় দফার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ছয় দফার পক্ষেই ম্যান্ডেট চেয়েছিলেন। এ ছয় দফাই পরবর্তী কালে স্বাধীনতার এক দফায় রূপান্তরিত হয়।

ছয় দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমিক, অন্যান্য রাজনৈতিক দল এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গড়ে ওঠে গণআন্দোল। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'

গঠন করে। পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-জনতা এক হয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক শামসুজ্জোহা গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ঘোষণা দিতে বাধ্য হন যে, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট হিসেবে অংশ নিবেন না। প্রবল প্রতিরোধের মুখে সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো আসনেই (জাতীয় এবং প্রাদেশিক) ভোটে বিপুল বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে এবং জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে (পূর্ব পাকিস্তান অংশ) ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে। এ বিজয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে বাঙালি জাতীয়বাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটে। সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল তারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত শেখ মুজিব হঠাৎ করেই 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে উঠেননি। প্রতিটি প্রয়োজনে তিনি মানুষের পাশে থেকেছেন, আস্থা অর্জন করেছেন। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে। এ দুর্যোগে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ সাধ্যমত মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন মানুষের আশা-আকঙ্ক্ষার প্রতীক, একান্ত আপনজন।

সত্তরের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু তথা বাঙালির হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণে টালবাহানা শুরু করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একাধিকবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। বাঙালিরাও ক্রমশ ফুঁসে উঠতে থাকেন। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এ ভাষণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে। ভাষণে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একইসাথে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনেরও রূপরেখা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। .... তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ...। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকেই জাতি মুক্তিযুদ্ধের কার্যকর প্রেরণা ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা পেয়েছিল। গুরুত্ব এবং প্রভাব বিবেচনা করেই ৪৬ বছর পর ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

৭ই মার্চের পরে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা আরো উত্তাল হয়ে উঠে। আলোচনার নামে শাসকগোষ্ঠী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৫ মার্চ কালোরাতে পাকবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের আগেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় 'মুজিবনগর সরকার'। পাকিস্তানে বন্দি থাকা অবস্থায় এ সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নামেই পরিচালিত হয় দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ। দীর্ঘ ২৩ বছর তিনি একটু একটু করে বাঙালিকে স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তুত করেছেন। এবার তারা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় শেখ মুজিব একজন তরুণ ছাত্রনেতা। কোলকাতা থেকে ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের ০৪ জানুয়ারি তিনি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব প্রদান, ছয় দফা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় নেতায় পরিণত হন। আগরতলা মামলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে। পরিণত বয়সের শেখ মুজিব হন বঙ্গবন্ধু। সত্তরের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয় বঙ্গবন্ধুকে বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পাকিস্তানের কারাগারে থেকেও বাংলা, বাঙালি এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অবিচল প্রেম ও দায়বদ্ধতা তাঁকে জাতির জনকের মর্যাদায় ভূষিত করে। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনই ছিল বাংলা ও বাঙালি তথা মাটি ও মানুষের জন্য নিবেদিত। আর এ কারণেই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুকে সমার্থক বলে বিবেচনা করা হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের একটি ক্রমপঞ্জি প্রস্তুত করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

'বঙ্গবন্ধু' ও 'স্বাধীন বাংলাদেশ' একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আমরা হয়ত আজো স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম না। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন কারাগারে। কিন্তু তাঁর জীবনের ব্রত ছিল এদেশের মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে মুক্ত করা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মানুষকে অধিকার সচেতন এবং মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর তিন লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বঙ্গবন্ধু হন আমাদের জাতির পিতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বঙ্গবন্ধুর কোন ভাষণ ইউনেস্কোর 'বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে?
(ক) ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভাষণ (খ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ
(গ) ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভাষণ (ঘ) ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির ভাষণ

২। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদের কতটি আসনে জয়লাভ করে?
(ক) ১৬৭টি (খ) ১৯৭টি
(গ) ২১১টি (ঘ) ২৮৮টি

৩। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কবে?
(ক) ১৯৬৬ সালের ৪ জানুয়ারি (খ) ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি
(গ) ১৯৭০ সালের ২৪ জানুয়ারি (ঘ) ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে কত সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

(ক) ১৯৪৮ সালে (খ) ১৯৫১ সালে

(গ) ১৯৫৬ সালে (ঘ) ১৯৫৮ সালে

২। ১৯৭০ সালের ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের কত মানুষ মারা যায়?

(ক) এক লক্ষ (খ) দুই লক্ষ

(গ) সাড়ে তিন লক্ষ (ঘ) প্রায় ৫ লক্ষ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রয়েছে–

(i) বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনের

(ii) পাকিস্তানের সামরিক শাসনের

(iii) ছিষট্টির ছয় দফা

(iv) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, iii ও iv (ঘ) i, ii ও iii

গ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ এর নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রেখেছে।

৪। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কত দফা উত্থাপন করেছিল?

(ক) ছয় দফা (খ) ১১ দফা

(গ) ১৭ দফা (ঘ) ২১ দফা

৫। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কতটি আসনে জয়লাভ করে?

(ক) ১৬৭টি (খ) ১৯৭টি

(গ) ২১১টি (ঘ) ২৮৮টি

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সজীব শহরের একটি স্কুলে পড়ে। তার দাদুভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি থাকেন গ্রামে। কিন্তু দাদুর সাথে যখনই দেখা হয় সজীব তার কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে চায়। দাদুও খুব আগ্রহ নিয়ে সজীবকে অনেক গল্প শোনান। দাদুর কাছে গল্প শুনে শুনে সজীব বঙ্গবন্ধু, ৭ ই মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চের কালরারাত্রি, ২৬ মার্চ, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, ১৬ ডিসেম্বর সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পেরেছে।

১) ছয় দফা প্রথম কবে কোথায় উপস্থাপন করা হয়েছিল? ১

২) ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল লিখুন। ২

৩) বাঙালি জাতীয়বাদ কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল ব্যাখ্যা করুন। ৩

৪) "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক" কেন, কিভাবে ব্যাখ্যা করুন। ৪